BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 29-42

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ : বাংলার রূপ সন্ধান

কৌশিক কর্মকার

সারসংক্ষেপ

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে গদ্যকার হিসেবেও কতখানি সফল ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর রিপোর্টাজধর্মী রচনাগুলি পাঠ করলে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক লিখনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। রচনাগুলি একইসঙ্গে অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য। অথচ তাঁর কবিতাকেন্দ্রিক সমালোচনার ধারায় যে ব্যাপ্তি লক্ষ করা যায়, গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ চর্চার সংখ্যা নগণ্য। তাই লেখকের রিপোর্টাজগুলিকে কেন্দ্র করে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজনেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধে'র রিপোর্টার হিসেবে নিযুক্ত হন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পি সি যোশী বা পূরণচাঁদ যোশীর কাছে পাঠ নেন সাংবাদিকতার আর সোমনাথ লাহিড়ীর কাছে শেখেন গদ্যরচনার কলাকৌশল। এই সময়েই পত্রিকার 'ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং' এর কাজে গ্রাম বাংলার সফর শুরু হয় তাঁর। মূলত পত্রিকার কমিটেড পাঠকের জন্য প্রতিবেদন লেখা শুরু করেন। কিন্তু লেখকের কবিমানস লেখাগুলিকে কেবল কেজো 'রিপোর্টিং' হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে সেগুলিকে করে তোলে 'রিপোর্টাজ'। বিবিধ সাহিত্যিক উপাদানের সংযোগে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে লেখাগুলি। বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণোদনায় লেখাগুলি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হয় মাসিক 'রংমশাল' পত্রিকায়। এই লেখাগুলিই একত্রে সংকলিত হয়ে ১৯৫১ সালে 'আমার বাংলা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখকের 'রিপোর্টাজ'ধর্মী লেখার এটিই প্রথম সংকলন। এরপর প্রায় চার দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লেখকের এরূপ ছ'টি রিপোর্টাজধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: 'আমার বাংলা' (১৯৫১), 'যখন যেখানে' (বঙ্গাব্দ ১৩৬৭), 'ডাকবাংলার ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭২), 'নারদের ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৬), 'ক্ষমা নেই' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৮), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)।

'রিপোর্টিং' নির্দিষ্ট গতে বাঁধা বিন্যাসে বিন্যস্ত; অন্যদিকে 'রিপোর্টাজ' সংরূপগতভাবে অনেকাংশে স্বাধীন প্রকাশমাধ্যম; ন্যারেটিভের বহুমাত্রিক শিল্পকুশলতাকে প্রকাশ করতে তা সক্ষম। সেজন্যই এই রচনাগুলিতে কখনো খুঁজে পাওয়া যায় ছোটগল্পের গঠনবিন্যাস, কখনো বা ফুটে ওঠে রম্যরচনার আবহ। সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে লেখাগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলার চিরায়ত লোকগান রূপকথা ব্রতছড়ার স্বর ও সুর, প্রান্তিক মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আকার পেয়েছে লেখকের কলমে। এককথায় 'রিপোর্টাজ' নির্মিত হয়েছে এক স্বতন্ত্র ফর্মে।

কৌশিক কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়
পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: koushikk31@gmail.com

মূলশব্দ

রিপোর্টিং, রিপোর্টাজ, সংরূপ, কথনশৈলী, ভাষাশৈলী

পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয় ও আঙ্গিকগতভাবে 'রিপোর্টাজে'র তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শৈলীগত বিশিষ্টতা পর্যালোচনার জন্য ভাষাবিজ্ঞানগত প্রকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনটি 'ভ'-এর ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ; সেই তিনটি 'ভ' হল ভূমি, ভাষা ও ভবিষ্যৎ[১]। এই তিনটি 'ভ'-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনির সিরিজ যা 'রিপোর্টাজ' নামেই সমধিক পরিচিত। অখণ্ড বঙ্গদেশের ভূমি, বাংলা ভাষা ও বাঙালির ভবিষ্যতের কথাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। সংরূপগতভাবে রচনাগুলিকে এখানে ভ্রমণকাহিনি বলা হল বটে, তবে এই লেখাগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট সংরূপের সীমায় আবদ্ধ করা সমীচীন নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দৈনিক 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য রিপোর্টাজ লেখা শুরু করেন ১৯৪৩ সালে। এই বছরেরই ২৮শে জুলাই 'জনযুদ্ধে'র পাতায় লেখকের বর্ধমানের বন্যা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল লেখকের প্রথম রিপোর্টিং :

> 'আমাকে যেতে হবে আবার সেই বর্ধমান। না, এবার আর ধোপার গাধা হয়ে নয়। বন্যার খবর আনতে। কাগজের রিপোর্টার হয়ে। সঙ্গে যাবে টুনুদা। পার্টির ডাকসাইটে ফটোগ্রাফার সুনীল জানা। শুনে আমি আহ্লাদে আটখানা। বলতে গেলে আমার ভ্রমণের পালা এই দিয়ে শুরু। তখন আমি যাকে বলে একেবারেই গ্রীণ হর্ণ। ভালো করে শিং গজায়নি। কাগজে এটাই হবে আমার জীবনের প্রথম রিপোর্ট। ওরফে ভ্রমণ কাহিনী।'[২]

এরপর ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত এরকম বেশকিছু প্রতিবেদন ও মাসিক 'রংমশালে' প্রকাশিত কয়েকটি গদ্য নিয়ে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় গ্রন্থ 'আমার বাংলা'। লেখকের 'রিপোর্টাজ'ধর্মী লেখার এটিই প্রথম সংকলন। এরপর প্রায় চার দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লেখকের এরূপ ছ'টি রিপোর্টাজধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : 'আমার বাংলা' (১৯৫১), 'যখন যেখানে' (বঙ্গাব্দ ১৩৬৭), 'ডাকবাংলার ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭২), 'নারদের ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৬), 'ক্ষমা নেই' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৮), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)।

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার কমিটেড পাঠকের জন্য তদন্তমূলক রিপোর্টিং হিসেবে যে প্রতিবেদন রচনার সূত্রপাত হয়েছিল তা কালক্রমে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার জনপ্রিয় কলাম হয়ে ওঠে। একারণেই হয়তো গোড়ার দিকের রচনায় যেখানে বাংলার অগণিত বঞ্চিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে সহযোদ্ধার সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়, পরবর্তীকালে তার বদলে একপ্রকার সহমর্মিতার আবহ লক্ষ করা যায়।

রচনাগুলির কালিক পটভূমি যেমন দীর্ঘ চার দশক ব্যাপী বিস্তৃত তেমনি তার স্থানিক পটভূমি হিসেবেও বাংলার প্রায় প্রতিটি প্রান্ত নির্বাচিত হয়েছে। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হোক বা অধিবাসীদের বৃত্তিগত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে, বাংলা ও বাঙালির সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধে'র কাজে যুক্ত হন। রিপোর্টার হিসেবে অচিরেই অত্যন্ত সফল হয়ে ওঠেন তিনি। লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অরুণ সোম তাঁর এক স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন :

> 'ভ্রমণকারী হিসেবে তাঁর দুটো বড় গুণ ছিল। বিদেশে একবার কোন জায়গার রুট বা যাত্রাপথ দেখিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার কারও সাহায্য ছাড়া, বিনা বাক্যবিনিময়ে ট্রামে-বাসে চেপে ঠিক সেখানে পৌছে যেতে পারতেন– কোন ভুল হত না। দ্বিতীয়ত, ভাষা ছাড়াই বা অল্প ভাষায় ভাব বিনিময়ের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল।'[৩]

একারণেই জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাদের চোখ দিয়ে তাদের আনন্দ-বেদনা-অনুভূতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তিনি। আর তাঁর কবিমানস বিবিধ সাহিত্যিক উপাদান সহযোগে সেই রিপোর্টিংকে কেবল প্রতিবেদন সুলভ নিষ্প্রাণ গদ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে পরিণত করেছিল প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ রিপোর্তাজে। লেখকের রিপোর্তাজ আর সংবাদপত্রের রিপোর্টিং এর মধ্যে রয়েছে কিছু মৌলিক পার্থক্য :

> 'রিপোর্ট নিছক রিপোর্ট। ঘটনার সাদাসাপটা বিবরণ মাত্র সে। রিপোর্তাজ রিপোর্টের 'সত্য'-ছাঁচে গড়ে ওঠা সেই ন্যারেটিভ, যা গড়ে তোলে একটি ভিন্ন নান্দনিক কাঠামো। রিপোর্ট নিছক 'সত্য', রিপোর্তাজ সত্য ও সুন্দরের যুগলবন্দি। রিপোর্তাজ 'typical style of reporting events' এবং তাকে ছাপিয়ে যেতে চাওয়া অন্য সাংবাদিক গদ্য। রিপোর্তাজ মূলত কাব্য।'[৪]

সংবাদপত্রের রিপোর্টিং যা কিনা ফর্মের দিক থেকে নির্দিষ্ট গতানুগতিক বন্ধনে আবদ্ধ, তার তুলনায় রিপোর্তাজে রয়েছে লেখকের আঙ্গিকগত স্বাধীনতা যা ন্যারেটিভের বহুমাত্রিক শিল্পকুশলতাকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

'আমার বাংলা'য় সংকলিত প্রতিবেদনগুলি লেখকের রিপোর্তাজ জীবনের গোড়ার দিকের রচনা। চল্লিশের দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সদস্য, 'জনযুদ্ধে'র সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্ধমানে গিয়েছিলেন বন্যা 'কভার' করতে। গ্রন্থে সংকলিত 'বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ' শীর্ষক রচনাটির নেপথ্যে রয়েছে লেখকের উক্ত বর্ধমান সফর। পার্টির কাগজের জন্য খবর সংগ্রহ করতে লেখক এসময়ে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম-শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরাধীন দেশের কৃষক-শ্রমিকের নিদারুণ বঞ্চনা অনুভূতিশীল মন নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি; সেই বঞ্চনার আখ্যান প্রকাশ করেছেন সাধারণের মুখের ভাষাতেই সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিতভাবে :

> 'সেটা ছিল বিয়াল্লিশ সাল। সে সময় অনেকদিন কবিতা লেখা বন্ধ ছিল। গ্রাম ও শিল্পাঞ্চল ঘুরে রিপোর্তাজ লিখতে লাগলাম। লোকের খুব পছন্দ হয়েছিল সে লেখা। সাধারণ মানুষের মুখের কথাই আমার লেখায় ব্যবহার করেছি। এই ভাষাকে লোকে ভীষণ বাহবা দিয়েছে। চাক্ষুস দেখাশোনা ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্প। যা দেখেছি তার বেশি লিখিনি।'[৫]

'আমার বাংলা'য় সংকলিত রচনাগুলির সবই যেহেতু স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের রচনা, তাই এগুলি লেখা হয়েছে অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষাপটে। যে বাংলা এক বিরাট ভৌগোলিক ভূখণ্ডে ব্যাপৃত, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে নদীনালাপূর্ণ জলময় সুন্দরবন, পশ্চিমে রুক্ষ লাল মাটির মালভূমি অঞ্চল থেকে পূর্বে চট্টগ্রামের পার্বত্য ভূখণ্ড পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। এই বৃহত্তর বঙ্গদেশের ভূখণ্ডগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে রয়েছে জাতিগত বৈচিত্র্য, সেইসূত্রে এসেছে ভাষিক ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা। এসকল বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব সমগুরুত্বে উঠে এসেছে 'আমার বাংলা'র পাতায়; যার প্রমাণ পাওয়া যায় সংকলনের প্রথম রচনাটিতেই। যে রচনার বিষয়বস্তু গারো-হাজংদের মতো প্রান্তিক জনজাতিরা, যাদের চোখে মূলনিবাসী বাঙালিরা 'বাঙাল' ছাড়া অন্য কিছু নয়। মূলত কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা এই রিপোর্টাজের কথনশৈলীটি অত্যন্ত চমৎকার। আলোচ্য রিপোর্টাজটি শুরুই হচ্ছে পাঠককে সরাসরি 'তুমি' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। এখান থেকেই কথক-পাঠকের আত্মীয়তার শুরু; রিপোর্টাজটি যেন উভয়ের সম্মিলিত ভ্রমণকাহিনি। খানিকটা বৈঠকী গল্পের ধাঁচে কথক তাঁর পাঠককে কাছে টেনে নেন এভাবে। ভ্রমণ সঙ্গী হিসেবে উভয়ের বাক্যালাপ চলতে থাকে। কথক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ করে তোলেন পাঠককে, কখনও স্বাভাবিক কর্তব্যবোধে সতর্কও করে দেন :

> ক) 'চৈত্র মাসে যদি কখনও মৈমনসিং যাও, রাত্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে। দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই; আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।'[৬]
>
> খ) 'সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট– কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছ, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'[৭]

পরের রিপোর্টাজটির শিরোনাম 'ছাতির বদলে হাতী'; রিপোর্টাজটির সূচনাবাক্যটি এরূপ: 'নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক্‌ডুমা ডুম ডুম'।[৮] বাক্যটি নিমেষে ছোটদের উপযোগী একটি আকর্ষণীয় আবহ গড়ে তোলে। এরূপ আবহ তৈরি হলেও এই রিপোর্টাজটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গম্ভীর; মহাজনের বন্ধকী কারবার কীভাবে সাধারণ সরল গ্রামবাসীদের প্রতারিত করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেয়, তারই জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। পূর্ববর্তী রচনাটিতে যেমন এসেছিল সাধারণ মানুষকে দিয়ে জমিদারের বেগার খাটানোর দৃশ্য। উভয় রচনারই স্থানিক পটভূমি গারো পাহাড় সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল। আলোচ্য রচনায় চেংমান নামের এক চাষীর মহাজনের ছাতি ধার করে হাতির দাম চোকানোর কথা আছে। তবে উভয় রচনাতেই জমিদার-মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনি ধ্বনিত হয়েছে; যেখানে কথক তাঁর ইচ্ছের সঙ্গে পাঠককেও শামিল করে নেয় :

> 'যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন যোগায়- ইচ্ছে করে, জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাঁদের হাতে দিই, মহাজনের নিষ্ঠুর ঋণের বোঝা থেকে তাঁদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না?'[৯]

এই গ্রন্থেরই অপর একটি রিপোর্টাজ 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা'। কবিয়াল রমেশ শীলের কাহিনি এটি। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে চট্টগ্রামের কবিগায়ক রমেশ শীল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গান বেঁধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ

তুলেছিলেন; সংগঠিত করেছিলেন এলাকার আপামর জনসাধারণকে। রমেশ শীলের কাহিনি বিবৃতির এই আখ্যানের কথন কৌশলটি অনেকটা চীনে বাক্সের মত বিন্যস্ত, যেখানে বড় বাক্সের ভেতরে ছোট, তার ভেতরে আরো ছোট, এমনভাবে সাজানো থাকে। এখানে একটি কাহিনির সূত্র ধরে অপর একটি কাহিনির সূচনা হয়, সেই কাহিনির খেই ধরে নতুন আরেকটি কাহিনি আসে। কাহিনি সংকলনের এই বিশেষ বয়ন কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে। রিপোর্তাজটিতে পাঠককে রীতিমতো পথ দেখিয়ে রমেশ শীলের বাড়িতে উপনীত করেন কথক; এরপর জানতে চান তাঁর গান লেখার ইতিহাস :

> 'বললাম কেমন করে গান বানাতে শিখলেন সেই গল্প আমাদের বলতে হবে। টিকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে গল্প শুরু করলেন রমেশ শীল।'[১০]

এখান থেকেই শুরু হয় রমেশ শীলের জীবনের গল্প; কীভাবে সামান্য গায়ক হিসেবে জীবন শুরু করে ক্রমশ হয়ে ওঠেন 'মাঝভাণ্ডারের মাঝি'। কবিগান সম্পর্কিত বেশ কিছু পরিভাষার (চাপান, কাটান, যাটক) খোঁজ মেলে এখানে; উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর লেখা একটি গানও :

> 'পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
> দেহ টেকা হয়েছে কঠিন
> রমেশ কয়, আঁধারে মরি
> পাই না কেরোসিন।'[১১]

আলোচ্য রিপোর্তাজটিতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টি তা হল রমেশ শীলের কবিগান লেখার পশ্চাতে দৈনিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ভূমিকা; যে পত্রিকা পড়েই তাঁর গানের দিক বদল ঘটে যায়, চট্টগ্রামের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় দীক্ষিত করে তোলেন কবি।

উপরিউক্ত রিপোর্তাজটির ক্ষেত্রে যে কথনশৈলীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ একটি কাহিনির সূত্রে অন্য একটি কাহিনির অবতারণার কৌশলটি ছোটগল্পের একটি বিশেষ ধরন হিসেবে জনপ্রিয়। যেখানে বাইরের কাহিনিটিকে 'ফ্রেম গল্প' আর ভেতরের কাহিনিটিকে মূল গল্প হিসেবে অভিহিত করা হয়। লেখকের পরবর্তী গ্রন্থে 'যখন যেখানে' (১৯৬০) সংকলিত বেশ কয়েকটি লেখায় এরূপ ছোটগল্পের সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম 'একটি প্রতিবাদ পত্র'; রচনাটির মুখ্য চরিত্র 'বিজুদি', তার সঙ্গে 'শম্ভুদা'র প্রেম কাহিনির একটি রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে। এরকম আরেকটি রচনা 'এইটুকু'। যেখানে শুরুতে বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে কলকাতার এক গলির বিশদ চিত্র দেখানো হলেও পরবর্তীকালে সেই গলির সূত্র ধরে আসে সেই গলির অধিবাসী নিবারণবাবু ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের কাহিনি। যাঁর লেখায় সমষ্টির সাংগঠনিক শক্তির জয়গান গাওয়া হয়ে থাকে, তাঁর লেখাতেই এরূপ ব্যক্তিজীবনের বিবিধ অনুভূতির চিত্রণ কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী বলেই মনে হয়। 'এইটুকু' শীর্ষক রচনাটির সমাপ্তি বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: 'গলির মধ্যে ঢুকে সেই সব পুরনো কথা মনে করতে করতে এককালে এ-পাড়ায় থাকা চল্লিশ বছরের এক বুড়ো মিন্‌সে হঠাৎ এইটুকু হয়ে গেল।'[১২] পুরো কাহিনিটিই যেন এই শেষ বাক্যটির প্রস্তুতি। এভাবে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় রচনাগুলিতে। এই

গ্রন্থের অপর দুটি রিপোর্টাজ 'আসমান জমি' ও 'কাঁটাতারের বেড়ায়' লেখকের বক্সা জেল-জীবনের প্রেক্ষিতে রচিত। 'আমার বাংলা'য় সংকলিত 'মেঘের গায়ে জেলখানা' রচনাটিরই অনুবর্তন এই দুটি রচনা। ১৯৪৮ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলে পার্টির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে দমদম জেলে, পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ভুটান সীমান্তে বক্সায়। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বক্সা জেলে সহবন্দীদের সঙ্গে লেখকের দিন যাপনের বিবরণ আছে এখানে। সহবন্দীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের মুখচলতি গল্প বিবৃত হয়েছে। জেল উত্তর পর্বে লেখক চটকল মজদুর সংগঠনের কাজে সস্ত্রীক চলে আসেন বজবজের কাছে ব্যঞ্জনহেঁড়িয়া গ্রামে। চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে কাজের সূত্রে তাদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। রিপোর্টাজে তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভাষা পেয়েছে। ১৯৫২ সালে, যখন তিনি বজবজের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, সেই বছরেরই ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে উত্তাল ঢাকা শহরে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে শহিদ হন পাঁচ বঙ্গসন্তান। 'একুশের সুরে বাঁধা' শীর্ষক রিপোর্টাজটিতে লেখক সেই সময়ের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। একুশের আন্দোলন নিয়েই এক অপূর্ব গদ্যশৈলীতে লেখা 'লিখতে বারণ'। অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররূপময় গদ্যের অনুরূপে এখানে রূপকথার আঙ্গিকে ব্যক্ত হয়েছে লেখকের বক্তব্য। বিষয় ও আঙ্গিকের এরূপ বৈচিত্র্যের জন্যই লেখক ভূমিকায় এই গ্রন্থকে চিহ্নিত করেছিলেন 'বাউলের আলখাল্লা' হিসেবে; যেখানে সকল বৈসাদৃশ্যের মিলন ঘটে।

'ডাকবাংলার ডায়েরি'র অধিকাংশ লেখাগুলিই 'সুবচনী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা ও পটভূমিকা' অংশে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য জ্ঞাপন করেছেন লেখক। দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় রিপোর্টাজগুলির শিরোনাম ছিল স্থাননামসূচক; গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সেগুলির নতুন শিরোনাম প্রদত্ত হয়। যেমন 'আবার বনগাঁয়' শিরোনামের রিপোর্টাজটি গ্রন্থে হয়ে দাঁড়ায় 'এপার বাংলা'। আলোচ্য রিপোর্টাজে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত Code Language-এর বিশেষ ব্যবহার। বেশ কিছু সাংকেতিক শব্দের ('হাংরি', 'হাঙ্গি-মাঙ্গি', 'উইদাউট', 'কেস') ব্যবহার এখানে লক্ষ করা যায়। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালানসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ভাষাগত সংবিধি। এই রিপোর্টাজেই বনগাঁ ভ্রমণের পরের পর্বে রয়েছে বনগাঁ পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিভ্রমণ; তার মধ্যে অন্যতম হল বিভূতিভূষণের গ্রাম বারাকপুর। লেখকের বর্ণনায় 'পথের পাঁচালী'র সংস্থানই যেন উঠে এসেছে এখানে। বালক অপুর বেড়ে ওঠার সেই প্রতিবেশ বর্ণনা পাঠককে নস্টালজিক করে তোলে। সেই কুঠির মাঠ, বাঁওড়, আঁশশেওড়ার বন, গ্রামের সরল সাদাসিধে মানুষগুলো ভিড় করে আসে রিপোর্টাজের পাতায়। পরিচয় ঘটে বিভূতিভূষণের বাল্যবন্ধু ইন্দুভূষণ রায়ের সঙ্গে। উপন্যাসের সময়কাল আর বর্তমান সময়কালের পার্থক্যটি প্রকট হয়ে ওঠে লেখকের কাছে :

> 'নিশ্চিন্দিপুর আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। দ্বিতীয় অপু আর জন্ম নেবে না। তা নিয়ে দুঃখ করেও খুব লাভ নেই। দেশ-কাল-পাত্রের রূপান্তরে সাহিত্যেও নবযুগ না এসে পারবে না।'[১৩]

দুই সময়কালের মধ্যে ঘটে গেছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, দেশভাগের ফলে আছড়ে পড়েছে উদ্বাস্তু স্রোত; দেশ-কালের চালচিত্র গেছে বদলে। জীবন ধারণের তাগিদে উদ্ভূত হয়েছে নিত্যনতুন পেশা; সীমান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত।

'ডাকবাংলার ডায়েরি'র ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্বরূপ বিচার করার তাগিদেই তাঁর এই পর্বের ভ্রমণযাত্রা। সীমান্তবর্তী বনগাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষা দিয়ে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল তারই পরিণতি দেখা যায় রাঢ় বাংলার গ্রামে। 'ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর' শীর্ষক রিপোর্তাজে রয়েছে বর্ধমানের কামারপাড়া আর কাঞ্চননগর ধাতুশিল্পের জন্য বিখ্যাত ধাতুশিল্পীদের বর্তমান বিপন্নতা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় সমবায় ব্যবস্থার কথা। কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিল্পীর পক্ষে করা অসম্ভব, একমাত্র সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমেই তার সর্বাত্মক সুরাহা করা সম্ভব। 'তাল-দীঘি লাল-মাটি' রিপোর্তাজটি অনেকাংশেই চলচ্চিত্রধর্মী। জয়দেব-কেঁদুলির মেলা কেন্দ্রিক এই রচনাটিতে চলচ্চিত্রের মতো পর পর এক একটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে। মেলার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে ডিটেলিংসহ, পাঠকের যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে যায় এক্ষেত্রে। মুর্শিদাবাদের নিমতিতা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখা 'নিম নয়, তিতা নয়'। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ও 'দেবী'র চিত্রগ্রহণের সৌজন্যে বিখ্যাত নিমতিতার অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল বদল ঘটেছে বিড়িশিল্পের হাত ধরে। এক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে মেয়েদের অংশগ্রহণই সমধিক; স্থানীয় মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে, স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হুগলি জেলার আরামবাগ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর' নামের লেখাটিতে। মূলত আলু উৎপাদক এই অঞ্চলে হালে হিমঘর গড়ে উঠছে দ্রুত; বদলে যাচ্ছে কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি। এখানেই একটি গ্রাম কেশবপুর, এই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ভেটিপাড়ায় বাগ্‌দি জাতির বসবাস। স্থানীয় এক অধিবাসীর সঙ্গে লেখকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে গ্রামের গোষ্ঠী মননের কথা। কীভাবে একটি ঘটনা গ্রামের সকলের সম্মিলিত অভিমত গড়ে তোলে, কীভাবে ভ্রান্ত দর্শনকে আঁকড়ে ধরে গ্রামীণ সমাজ, তার পরিচয় মেলে এখানে। প্রাসঙ্গিক তিনটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত হল :

> 'লেখাপড়া করেন? লেখাপড়ার মুখে আগুন! ঐ যে আমাদের পাড়ার মাস্টার... লেখাপড়া শিখে তার এমন দেমাক হয়েছে যে বাগদীদের সমাজে আর মিশতে চায় না।'[১৪]

জাতপাতে বিদীর্ণ গ্রাম্য সমাজে নীচু শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত বাগ্‌দিদের একটি ছেলে পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থে লেখাপড়া শিখে পরিবার তথা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে চাকরি নিয়ে নাগরিক সমাজে অধিষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি তাদের কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসভঙ্গের শামিল। যাকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, তার নাগরিক অভিবাসন তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে, হতাশাগ্রস্ত করে তোলে; শ্রেণিগত শত্রু হয়ে ওঠে উদ্দিষ্ট যুবকটি। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে লেখক উক্ত যুবকের সিদ্ধান্তটিকে একপ্রকার পলায়মান মানসিকতা রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

লেখকের পরবর্তী গ্রন্থ 'নারদের ডায়েরি'র একটি অন্যতম রিপোর্তাজ 'মরশুমের দিনে'। অন্যান্য রিপোর্তাজের মতো এটি কোনো অঞ্চলকেন্দ্রিক প্রতিবেদন নয়, এই লেখাটির বিষয় বাংলার বর্ষা। রিপোর্তাজটি প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল 'নতুন সাহিত্য' (নবপর্যায়) পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ সংখ্যায়। একটি বিদেশি প্রকাশনার প্রতিনিধি হিসেবে জনৈক নাইজেল কেমরন সত্যজিৎ রায়ের পরামর্শে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লেখার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধেই লেখক বাংলার বর্ষা নিয়ে লেখেন 'মরশুমের দিনে'। তবে লেখাটি লেখকের স্বনামে প্রকাশিত না হয়ে ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার এই চিরায়ত শস্যশ্যামল প্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে তার ব্যাপ্ত বর্ষাকাল। বাংলার জলবায়ু ও প্রকৃতির এই যোগসূত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান। যার প্রমাণ মেলে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় ব্রতকথার মধ্যে। বাংলার লোকায়ত এই ব্রতকথা বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ; বাংলার সংস্কৃতির বীজবাক্য লুকিয়ে রয়েছে এর ছড়ায়, উপকরণে, আচরণে। এই ব্রতকথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই গৌরবময় অতীতের কথা, যখন বাংলার বণিকেরা আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, পাড়ি জমাত দূর দূরান্তে। বর্ষার শেষে অনুষ্ঠিত ভাদুলি ব্রতে যেখানে বাড়ির মেয়েরা বাপ-ভায়ের নিরাপদ প্রত্যাগমন প্রার্থনা করছে, তা সেই প্রাচীনত্বের অনুষঙ্গ বহন করে আনে। এমনই আরেকটি ব্রত বসুধারা যা বর্ষার শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত কামনা করে পালনীয় এই ব্রতের উপকরণও ভীষণভাবে বাংলার গ্রাম সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্রতকথা ছাড়াও ডাক-খনার বচন, বিবিধ ছড়া প্রবচন, অম্বুবাচী পরব, মনসা পুজো বাংলার বর্ষার সঙ্গে সংযুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার এসকল নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচলন ক্রমহ্রাসমান হলেও তাদের বিস্মৃতির অতল থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এজাতীয় প্রতিবেদনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ একসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লী অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ছিল, কালের নিয়মে তার বদল ঘটেছে। উদ্বৃত্ত সম্পদের বাজারজাতকরণ ঘটেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, শিল্পস্থাপন হয়েছে। বাংলার গ্রাম আজ বিশ্ব অর্থনীতির অংশ। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে বাঙালি যেন কোনোভাবেই তার শিকড়কে ভুলে না যায়, তার আত্মাকে অস্বীকার করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে দুই সময়ের মেলবন্ধন ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন লেখক, সে দিক থেকে আলোচ্য রিপোর্টাজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'ক্ষমা নেই' এর রিপোর্টাজগুলি বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেখা। মুক্তিযুদ্ধের সেই অস্থির দিনগুলিতে বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি খানসেনা বা রাজাকার বাহিনী নৃশংসতার যে নজির সৃষ্টি করেছিল তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। লেখাগুলি সমকালে কিছুটা বিতর্ক তৈরি করলেও ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলেই আশা করা যায়।

১৯৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'আবার ডাকবাংলার ডাকে', 'ডাকবাংলার ডায়েরি'রই অনুবর্তন। 'জনযুদ্ধে'র পৃষ্ঠায় একসময়ে যে রিপোর্টাজ লেখার সূচনা ঘটেছিল, তারই শেষ পর্যায় এই 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'। ১৯৭৬-৭৭ সালে আনন্দবাজারে এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। প্রথম রিপোর্টাজ 'যাচ্ছি বনগাঁয়'তে লেখক জানাচ্ছেন :

> 'ডাকবাংলার ডায়েরি' লেখার সময় যে যে জায়গায় গিয়েছিলাম, আমি চেষ্টা করব আবার সেই সেই জায়গায় যেতে। এই দু-দশকে সেই সব জায়গার কতটা কী বদল হয়েছে দেখেশুনে আসবার চেষ্টা করব এটা আমার মনোগত অভিপ্রায়।'[১৫]

মূলত পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবিবর্তনের, বিশেষত জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বা জীবনযাত্রার মানের একটি রূপরেখা অঙ্কন করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি রিপোর্তাজের স্থানিক পটভূমিও সীমান্তবর্তী বনগাঁ ও সংলগ্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। চতুর্থ রিপোর্তাজটির শিরোনাম 'অপুদুর্গার জগৎ'। আগের পর্বে বিভূতিভূষণ-জন্মভূমে যে বদলের সূচনা দেখে এসেছিলেন, এই পর্বে সেই বদলেরই আরো সর্বাত্মক রূপ লক্ষ করেছেন। গ্রামের মানুষ আরো বিপন্ন, সমবায় সমিতি ধ্বংস হয়েছে, বিভূতি-বন্ধু ইন্দুবাবুর মৃত্যু হয়েছে; এবারে তার বদলে পেয়েছেন ফণীবাবু, পতিতবাবুদের। প্রকৃতিগতভাবেও ক্রমাগত ঐশ্বর্যহীন হয়ে পড়ছে বিভূতিভূষণের বারাকপুর। বিভূতিভূষণের প্রিয় ঘেঁটুফুল বানের জলে বিলুপ্ত। এক ক্রমক্ষয়িষ্ণু অপু-দুর্গার জগৎকে এবারে আবিষ্কার করলেন লেখক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে, মামার বাড়িতে। সেই সূত্রে তাঁকে একজন কৃষ্ণনাগরিক হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে। রিপোর্তাজ লেখার শেষ পর্বে কৃষ্ণনগরসহ নদিয়ার দ্রষ্টব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন চারটি রচনায়। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে এরূপ গভীর যোগসূত্র থাকার সুবাদে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচিত হয়েছে তা হলো কৃষ্ণনগরের ভাষা। বস্তুত ভাষা নিয়ে একটি বিশেষ মনোযোগ লেখকের রিপোর্তাজে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। গারো হাজংদের ব্যবহৃত বাংলার উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য দিয়ে যে চর্চার সূত্রপাত, বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে খনি শ্রমিকদের কাজের সূত্রে নির্মিত 'পাঁচমিশেলি ভাষা' হোক বা বনগাঁ সীমান্তের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ; সর্বত্রই কথ্য ভাষার প্রতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায় লেখকের রচনায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বহুবিচিত্র কথ্যভাষার মধ্য থেকে যে অঞ্চলের ভাষা মান্য চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, অনেক ভাষাবিদের মতেই তা হল কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর অঞ্চলের ব্যবহৃত কথ্যভাষা। সে কারণে কৃষ্ণনাগরিকরা তাদের কথ্যভাষা নিয়ে কিছুটা হলেও অলক্ষে গৌরবান্বিত হয়ে থাকে। লেখকও জানিয়েছেন :

> 'সব বাঙালীর কাছেই কৃষ্ণনগরের মুখের কথার খুব আদর। প্রমথ চৌধুরী মোটের ওপর একেই বাংলা ভাষার ছাঁচ করতে চেয়েছিলেন।'[১৬]

'নদেয় এল বান' শীর্ষক রিপোর্তাজটিতে লেখক উক্ত অঞ্চলের ভাষাকে বিশ্লেষণ করেছেন আদ্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিকের মতো। ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও আন্বয়িক স্তরে দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে দু-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর: এ>ই; ছ>চ; ল>ন। যেমন: করেছি>করিচি; বলেছি>বলিচি; লেপ>নেপ; লেবু>নেবু। অনুকার শব্দের ক্ষেত্রে 'ট' বা 'ফ' ধ্বনির পরিবর্তে 'ম' ধ্বনির আধিক্য লক্ষণীয়; যেমন: খিচুড়ি-মিচুড়ি; শাক-মাক; জেল-মেল। সমার্থক শব্দ লোপের (Haplology) দৃষ্টান্তও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে; কৃষ্ণনগর>কেশনগর।

রূপতাত্ত্বিক স্তর: শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়; সঙ্গে>সাথে; ওঁর>ওনার; ওঁকে>ওনাকে; টাঙানো>খাটানো; গিয়ে>যেয়ে।

শব্দার্থতাত্ত্বিক স্তর: কোনো কোনো শব্দ সম্পূর্ণ নতুন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন: 'বিরাট' অর্থে

'বিপরীত' শব্দের ব্যবহার।

আন্বয়িক স্তর : আন্বয়িক স্তরের যে উদাহরণগুলি লেখক দিয়েছেন, সেগুলি অবশ্য কৃষ্ণনগরের এই প্রজন্মের কিশোর যুবকদের কথ্যভাষা থেকে আহৃত। 'ডাকার দরকার নেই' বোঝানোর জন্য 'অফ্‌করে দিন' বা 'গলা পড়ে যাওয়া' বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে 'ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে'।

ভাষা যে স্থিতিশীল কোনো পদার্থ নয়, পুরোমাত্রায় গতিশীল একটি বিষয়, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কথ্যভাষায় একটি ব্যাপক পরিবর্তন এসে যায়। বস্তুত উদ্বাস্তু আগমন, অভিবাসনের কারণে উক্ত অঞ্চলের কথ্য ভাষাতেও বদল এসেছে। প্রথাগতভাবে একজন ভাষাবিদ না হয়েও তিনি যেভাবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভাষার প্রতিটি স্তরের উপর সমগুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন তা সততই তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যাপক দেবেশ রায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, যে সময়ে 'সমাজভাষাতত্ত্ব' (Sociolinguistics) বা 'চিহ্নবিদ্যা'র (Semiology) মতো ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষ ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটেনি বা চর্চার পরিসরে সেভাবে গৃহীত হয়নি, সেসময়েও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর মতো তিনি কবিতা ও কর্মের প্রয়োজনে আলোচ্য বিষয়গুলি আবিষ্কার করেছিলেন।[১৭]

উক্ত চারটি রিপোর্টাজের প্রথমটির শিরোনাম 'মাটির কাজ মাটি না হয়'। দৈনিকে প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন 'মাটির জিনিস' ও 'কৃষ্ণনগরের পুতুল' একত্রিত করে লেখা হয়েছিল আলোচ্য রিপোর্টাজটি। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী সমাজকে নিয়ে রচিত এই রিপোর্টাজটি যে কতখানি জীবন্ত, শিল্পগুণান্বিত এই নামকরণটিই তার ব্যঞ্জনা বহন করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকেন্দ্রিক হলেও এই লেখাটির সূচনা হয়েছে জেলা সদর কৃষ্ণনগর থেকে 'একশো কিলোমিটারের কিছু কম' করিমপুর-শিকারপুর অঞ্চল থেকে। সমকালীন কৃষ্ণনগরের অর্থনৈতিক কাঠামো গভীরভাবে অনুধাবনের তাগিদেই লেখকের এই দূর সফর। ফিরতি পথে লেখকের গন্তব্য ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের কেন্দ্রভূমি। মৃৎশিল্পীদের এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ইতিহাস ও তাদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যাসমূহ আলোচিত হয়েছে। পরের রিপোর্টাজ 'নদেয় এল বান' কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ সরপুরিয়া-সরভাজার ইতিহাস অনুসন্ধান কেন্দ্রিক। নদিয়ার আরেক বিখ্যাত শিল্প তাঁতশিল্প। পরবর্তী রিপোর্টাজ ('সুতোর জটজঙ্গলে' ও 'অথ বাঘ-ছাগল কথা') দুটি তাঁতশিল্পকেন্দ্রিক। মহাজন বা মালিকের গ্রাস থেকে শিল্পী বা শ্রমিককে রক্ষা করার জন্য সমবায় ব্যবস্থার যে কোনো বিকল্প নেই, তা বারবার দ্বিধাহীন কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন লেখক। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বলে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাঁরা ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন উদ্ভাবনী চিন্তার সামর্থ রাখেন, কিন্তু কেবল নাগরিক আলোকবৃত্তের বাইরে থাকার কারণে তাদের মৌলিক ধারণাগুলি উপেক্ষিত থেকে যায়। সংবাদমাধ্যম বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে তাদের জন্য উপযুক্ত একটি মঞ্চ তৈরি হলে, তাদের সুপ্ত প্রতিভাও সম্যকরূপে বিকশিত হতে পারে; কর্মসংস্থান হতে পারে অজস্র যুবক-যুবতীর। এককথায় কোনো অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চালচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। ভাষা চিন্তা হোক বা অর্থনীতি চিন্তা, সময়ের তুলনায় যে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তার প্রমাণ মেলে আলোচ্য রিপোর্টাজগুলিতে।

'আবার ডাকবাংলার ডাকে'র শেষ রচনা 'তামাম শোধ'। সাংবাদিক জীবনের সামগ্রিক পাওয়া না-পাওয়ার

ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে এখানে। পূরণচাঁদ যোশীর প্রণোদনায় সোমনাথ লাহিড়ীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর সাংবাদিক পর্বের সূচনা ঘটেছিল পার্টির কাগজে। পরবর্তীকালে আনন্দবাজারসহ অন্যান্য কাগজেও লিখেছেন। পার্টির সহকর্মীরা অনেকে লেখকের এই অবস্থান মেনে নিতে পারেনি; সমালোচনা করেছে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া পোষণ করেছে। ভিন্নমতকে মেনে না নেওয়ার প্রবণতা যে অপরিণামদর্শিতার দৃষ্টান্ত, অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন লেখক। ভিন্নমতাবলম্বীদের একটি নির্দিষ্ট অভিধায় দাগিয়ে দিলে গাত্রদাহের হয়তো উপশম হয়, কিন্তু তাতে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না, তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

রিপোর্তাজের গদ্য ভাষার দিকে নজর রাখলে দেখা যায়, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন লেখক। কেবল শব্দ নয়, শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ধ্বনি গঠনটিও তাঁর কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ :

> 'শব্দ পড়া আর মানুষের মুখ থেকে তা শোনায় পার্থক্য অনেক। রকমারি মানুষ আর রকমারি স্বাদ তাদের কথায়। কথার সঙ্গে বিশেষ সুরটা শব্দটাতে যেন আলো জ্বালিয়ে দেয়।'[১৮]

একারণেই তাঁর সাহিত্যে ধোপার কাপড় কাচার আওয়াজ, ফেরিওয়ালার ডাক, নারীর ভাষার বিশেষ ধরন, লোকগানের সুর স্থান করে নিয়েছে। ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমেও উদ্দিষ্ট পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখার একটি সচেতন কৌশল লক্ষ করা যায় এখানে। তৎসম শব্দের বদলে কথ্য, মুখচলতি শব্দ তথা ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার রিপোর্তাজের ভাষাশৈলীকে জীবন্ত করে তুলেছে :

ক) পাহাড়ী নদী সোমেশ্বরী- সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে![১৯]
খ) হাওয়া বইছে সাঁই সাঁই।[২০]
গ) শুকনো পাতা জলে ভিজে বাতাসে পাঁক পাঁক গন্ধ।[২১]
ঘ) ধূ ধূ করছে বালি।[২২]
ঙ) একটু ভুল হলে সপাং সপাং চাবুক।[২৩]

আর এমন আটপৌরে, ঘরোয়া শব্দের আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে স্থিতিক্রিয়া বিবর্জিত সরল ছোট ছোট বাক্য:

ক) হিংস্র পার্বত্য নদী অজয়। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে তার উৎস।[২৪]
খ) সামনে বাবলা বনের ভেতর দিয়ে ধু ধু করছে নদী। নাম কীর্তিনাশা।[২৫]
গ) কলকাতা থেকে দেড় দু-ঘণ্টা। কাঁচড়াপাড়া থেকে দেড় ক্রোশ।[২৬]
ঘ) হাওয়ায় একটু-আধটু শীতের আমেজ। অথই অন্ধকারে অফুরন্ত রাস্তা।[২৭]

এই ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যেই লেখক নির্মাণ করেছেন অপরূপ সব চিত্রকল্প। বাংলার বৈভিন্ন্যময় রূপের একটি কোলাজ নির্মাণ করেছে তাঁর গদ্যভাষা:

ক) দূরে রোদ্দুরে চিক্‌চিক্ করছে জল। কাছে যাও সব মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে।[২৮]

খ) ট্রেনে করে আসতে যেতে দেখা বাংলাদেশ। ছোট বড় ডোবা। আম কাঁঠালের বাগান। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। ঘুঁটে লাগানো দেয়াল। ঋতুভেদে আকাশ আর মাঠের রকমারি রূপ। কোথাও গরু চরাচ্ছে রাখাল। কোথাও পাঠশালায় ছেলেরা পড়ছে। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি।[২৯]

গ) কিন্তু বর্ষা নামলে একবার শুধু বাইরে এসে দাঁড়াও। যেখানে ঘাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়বে সেখানে যেন কে সবুজ জাজিম পেতে রেখেছে। জমিতে ধান ডিগডিগ করে বেড়ে ওঠে।[৩০]

লোকভাষার বিভিন্ন উপাদানের সমবায় ঘটেছে এখানে। লোকভাষার অন্যতম অঙ্গ প্রবাদ প্রবচন; বিশেষত বাংলা ভাষার অন্যতম সম্পদ এগুলি। চলতি প্রবাদ প্রবচনের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায় রিপোর্টাজের গদ্যে। এছাড়া এসেছে ছড়া, ধাঁধা, ব্রতকথার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ :

ক) শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।[৩১]

খ) যেভাবে খোদার ওপর খোদকারি করে চলেছে বিজ্ঞান[৩২]

গ) জ্যৈষ্ঠে শুকা আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা।[৩৩]

ঘ) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বলগে চাষার বাঁধতে আল, বৃষ্টি হবে আজ না কাল।[৩৪]

কৃষক, শ্রমিক, বাউল, সাঁওতালদের মতো প্রান্তিক মানুষদের লোকগান গদ্যে উদ্ধৃত হয়েছে; গদ্যে ফুটে উঠেছে ভাষার লোকবৃত্তটি।

উপসংহার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ পড়ার অর্থ লেখকের বাংলা ভ্রমণের সঙ্গী হওয়া; কেবল দেখা নয়, সর্বার্থে অনুভব করার অভিজ্ঞতা ঘটে যায় এক্ষেত্রে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে তাদের কথা শোনার মধ্যে দিয়ে লেখকের অনুভবী মনের খোঁজ পাওয়া যায়। বর্তমানে, একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাংবাদিকতার জগতে একটি নতুন পরিভাষার উদ্ভব ঘটেছে 'স্লো জার্নালিজম': 'একটি নির্দিষ্ট এলাকায় থেকে সেখানের জনজীবন দেখতে দেখতে ও বুঝতে বুঝতে যাওয়া'[৩৫]। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রপ্ত করেছিলেন এজাতীয় মগ্ন সাংবাদিকতা। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা না থাকলে এরূপ গদ্য লেখা সম্ভব নয়। লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কবি শঙ্খ ঘোষের অকপট স্বীকারোক্তিতেও তার অনুরণন শোনা যায়

> 'মনে হতো, ঠিক, এই মানুষটিরই মুখে তো মানায় 'আমার বাংলা'। দেশকে কত আনাচেকানাচে থেকে জানেন ইনি। সারা দিন জুড়ে আমাদের সঙ্গে যেসব ভাবনার কথা তিনি বলেন, বেশির ভাগই হালকা চালে, তার মধ্যে কেবলই মিশে থাকে ভাষা-মানুষ-জীবন-জীবিকা নিয়ে এই বাংলাকে জানবার আর জানাবার এক নিরভিমান আবেগ।'[৩৬]

তথ্যসূত্র

১. শঙ্খ ঘোষ, *সম্পূর্ণ একক এক কবি*, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৫৩

৩. অরুণ সোম, *যাই একটু মস্কো থেকে ঘুরে আসি, কিংবা রুশ দেশ ও সুভাষ মুখুজ্জের আশ্চর্য কিস্‌সা*, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ৪ মার্চ ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪

৪. বিজয় সিংহ, *রিপোর্টাজের সুভাষ মুখোপাধ্যায়*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য, সম্পা. সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৭৫

৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৫৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০১

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪২

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯৬

১৭. দেবেশ রায়, *তাঁর জীবনই তাঁর উচ্চারণ*, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ৪ মার্চ ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪

১৮. জ্যোতিভূষণ চাকী, *শব্দের আঙিনায় দোসর*, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, সম্পা. শঙ্খ ঘোষ ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৩১

১৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩০

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫

২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২

২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৩

২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১

২৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭২

৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০০

৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১৬

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১

৩৫. অমিতাভ ঘোষ, *সুনীলদা আমাকে বলতেন, তুমি তো ইংরেজিতে বাংলা লেখো!*, উত্তর সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিদিন, ১৩ জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪

৩৬. শঙ্খ ঘোষ, *সামান্য অসামান্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৫০